সৈয়দ শামসুল হক : কবিতায় বোধ ও বিবর্তনের রূপকার

ইয়াসমীন আরা লেখা

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল বহুমাত্রিক স্রষ্টা– সব্যসাচী লেখক হিসেবেই যাঁর খ্যাতি সমধিক। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি শাখা তাঁর সৃষ্টিস্পর্শে হয়েছে সমৃদ্ধ– প্রবহমান স্রোতের মতো বেগবান। শিশুতোষ রচনা, স্মৃতিকথা, আত্মস্মৃতি, অনুবাদ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কলাম, ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, কাব্যনাট্য এবং চিত্রকলা ও ভাস্কর্য তাঁর হাতে বহুবিচিত্র শিল্প– প্রণোদনায় উৎকর্ষ সাধনে রেখেছে দীপ্তস্বাক্ষর। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও নিজস্ব সংস্কৃতির শেকড়ের সন্ধান সৈয়দ শামসুল হকের অন্তর্গত চেতনার শাণিত ফলক। আপন ঘরানার মৌলিক নির্মাণ শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমের মতো কবিতার শরীরেও এনে দিয়েছে বহুবর্ণিল নক্ষত্ররেখা। তাতে নন্দনকলার হাত ধরে আত্মসম্মানবোধের স্মারকও দাঁড়িয়ে থাকে শির উঁচু করে। বিশ শতকের পঞ্চাশের মৃত্তিকালগ্ন ষাট দশকে তাঁর প্রারম্ভিক উচ্চারণ– *একদা এক রাজ্যে* এবং *বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা* বাংলা কবিতার অঙ্গনে এনে দিয়েছে বহুমাত্রিকতার শুভসূচনা।

এর দুই দশক পূর্বেও বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্রবলয় থেকে বের করে নিয়ে আসার চলছিল অদম্য প্রয়াস। বৃত্তভাঙার এ-সময়ে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। তাঁর প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে কেঁপে উঠে দীর্ঘকালের সুরক্ষিত কাব্যকলার ভিত। তিরিশের পঞ্চকারিগরের অন্যতম কারিগর জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কণ্ঠে 'কবিতা অনেকরকম'[১] শীর্ষক এক অসাধারণ উক্তি প্রযোজিত হলে, এ-সকল যৌথ কর্মযজ্ঞে বাংলা কবিতার প্রজ্জ্বলন শিখা মহাসম্মেলনের রোপিত হয়ে যায় উদ্বোধনী কোরাস। সৈয়দ শমসুল হক পূর্বসুরিদের চেনা-অচেনা-অর্ধচেনা উদ্যান পরিভ্রমণের মাধ্যমে মন ও মননে সুশোভিত করে তোলেন নিজস্ব কানন। পঞ্চাশের কবিদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করেও ক্রমশ তিনি হয়ে ওঠেন স্বতন্ত্র।

লক্ষণীয় সৈয়দ শামসুল হক কবি হিসেবেই নিজের পরিচয় মুদ্রণে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ বোধ করতেন। কেন করতেন তা তাঁর জবানিতেই শোনা যাক :

> 'কবিতাকে আদিম কালের মন্ত্র রচনারই সম্প্রসারণ বলে আমি দেখতে পাই। কবিতাকে আমি অনুপ্রাণিত সংলাপ বলে অনুভব করি। কবিতার ভেতরে আমি জীবন-অভিজ্ঞতার সার আবিষ্কার করি। সংকেত প্রতীকে রূপকল্পে কবিতা আসলে তুলে ধরে আমাদেরই আশা-হতাশা, বোধ ও বিবেচনা, আনন্দ-দুঃখ, আর আমাদেরই অস্তিত্বের সংকোচন ও সম্প্রসারণের সংবাদ।'[২]

কবিতায় সৈয়দ শামসুল হকের এই অস্তিত্বের সংকোচন ও সম্প্রসারণের সংবাদ পঞ্চাশের দশকে লিখিত কাব্য *একদা এক রাজ্যে* থেকে শুরু করে পরবর্তী সময় জুড়ে কাব্যগ্রন্থসমূহে নির্মোহভাবে লক্ষ করা যায়।

সৈয়দ শামসুল হক চলেছেন তাঁর নিজস্ব পথে। আধুনিক মানুষের জটিল মনোভঙ্গি, আশা-আকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশকণাকে কখনো চেতন কখনো অবচেতন জগতের আবরণে

প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাঁর কবিতায়। প্রকাশভঙ্গি তাঁর নিজস্ব। ভাষা ব্যবহারের বরাবরই তাঁর নিরীক্ষাধর্মিতা লক্ষ করা যায়। তাঁর কবিতা 'অন্তর্গূঢ় ভাষাশৈলী এবং একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা। তবে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সৈয়দ হকের কবিতার ভাষা ও বক্তব্য দুই-ই অভিনব, পরস্পরের সঙ্গে জটিল বুননে সমীকৃত।

মনোজগতেই সৈয়দ শামুসল হকের কবিতার মূল বিষয়। যে সব কারণে মনোজগতের টানাপড়েন, সেই অন্তগূঢ় রহস্য ও তাঁর সম্পর্ক-সাহচর্যকে নিজের সংবেদনশীল অনুভববেদ্য মননে ধারণ করেন; কবিতার পঙক্তিতে বেরিয়ে আসে সূক্ষ্ম-সারাৎসার, গভীর অভিজ্ঞান আর চেতনার যূথবন্ধনে নতুন অভিপ্রায়। শৈল্পিক বোধ, শব্দ সচেতনতার কারণে তাঁর কবিতা নিজস্ব আদলে গড়ে ওঠে। দিনে দিনে তাঁর কাব্যের আধার পূর্ণ হয়েছে নানা মাত্রার উপাদানে। জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সংলগ্ন বিষয়কে নিজস্ব মনোভঙ্গি দ্বারা রাঙিয়ে উৎসারণ ঘটিয়েছেন নিজস্ব কবিতার জগত। নারী, প্রেম, রিরংসা, আত্মবেদনা, অসংগতি, ইতিহাস, সমাজ, পার্থিব সব বিষয়কে তিনি একাকার করেছেন। নিজের কল্পনা প্রতিভাকে ব্যববহার করেছেন সামগ্রিক জীবনের দ্যোতনাকে ধরে রাখার দুর্মর ইচ্ছে নিয়ে।

তাঁর কবিতার নানা পর্যায় আমরা লক্ষ করি। কবিতা লেখার প্রাথমিক দিন থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কবিতার বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে আছেন। আমাদের কবিতার সম্ভাবনা, শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে সতত সজাগ এই কবি, এদেশের কবিতাকে নানামাত্রায় বিকশিত করতে অবিরাম কাজ করে গেছেন। গীতিকবিতার দীর্ঘ মেয়াদি একরৈখিক নির্মাণ প্রণালী পাঠককে বিরক্তিকর এক অবসাদে নিয়ে যেতে পারে। এ প্রেরণা থেকে তিনি কবিতার আঙ্গিককে বড় হাতিয়ার হিসেবে নিয়েছেন। শব্দ সাজাবার কৌশল, শব্দ ব্যবহারের স্বাধীনতা ও জীবন প্রত্যয়ের সঙ্গে এক সাবলীল ভঙ্গিতে তাকে অন্বিত করার দুরুহ প্রচেষ্টায় তিনি সার্থক হয়েছেন। বাংলা ভাষায় কাব্যনাট্য রচনা তাঁর অন্যতম দৃষ্টান্ত। আঞ্চলিক বা উপভাষায় রচিত কাব্যে তিনি এদেশের পথিকৃৎ। এছাড়া চিত্রধর্মী কবিতা নির্মাণে তিনি অগ্রণী। সর্বোপরি, কবিতাকে নাটকীয় দোলা ও গহন অন্তর্লোকের রহস্যের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণে তাঁর কবিতা বাংলাদেশের অন্যতম সম্পদ। সব্যসাচী এই লেখক গদ্যকে কবিতার শৈল্পিক অচলায়তনে বাঁধতে সচেষ্ট হয়েছেন। সবসময় তাঁর ভঙ্গি নিজস্ব। ফলত সৈয়দ শামসুল হক বাংলাদেশের কবিতার একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত।

আমরা তাঁর অজস্র কবিতার চরিত্র বিচার করে, অংশত শ্রেণিকরণ করে তাঁর কবিতার মৌল বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা, সফলতা, বিফলতা ও শিল্পীকৌশলকে বিচার করার চেষ্টা করব। পাশাপাশি বাংলা কবিতা ও বহির্বিশ্বের কবিতার সঙ্গে তাঁর কবিতার সম্পর্ক ও সাযুজ্য নির্ণয়ের সুযোগ নিতে চেষ্টা করব।

সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যসত্তার সম্যক ধারণালাভে তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর দিকে একটু মনোযোগী হওয়া আবশ্যক মনে করি। কবিতা : একদা এক রাজ্যে (১৯৬১)[৩], বিরতীহীন উৎসব (১৯৬৯), বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা (১৯৭০), প্রতিধ্বনিগণ (১৯৭৩), অপর পুরুষ (১৯৭৮), পরাণের গহীন ভিতর (১৯৮০), নিজস্ব বিষয় (১৯৮২), রজ্জুপথে চলেছি (১৯৮৮), বেজান শহরের জন্য কোরাস (১৯৮৯), এক আশ্চর্য সংগমের স্মৃতি (১৯৮৯), অগ্নি ও জলের কবিতা (১৯৮৯), কাননে কাননে তোমারই সন্ধানে (১৯৯০), আমি জন্মগ্রহণ করিনি (১৯৯০), তোরাপের ভাই (১৯৯০), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯০), রাজনৈতিক কবিতা (১৯৯১), নাভিমূলে ভস্মাধার (১৯৯২), কবিতা সংগ্রহ (১৯৯৮) ও প্রেমের কবিতা (২০০০)। কাব্যনাট্য : পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬), গণনায়ক (১৯৭৬),

নুরুলদীনের সারা জীবন (১৯৮২), এখানে এখন (১৯৮৮), কাব্যনাট্য সমগ্র (১৯৯১) ও ঈর্ষা। কথা কাব্য : অর্ন্তগত।

সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যে লক্ষ করা যাবে যে, তিনি মূলত নিজেকে, নিজস্ব সত্তা-অস্তিত্বকে আবিষ্কার করে চলেছেন। মানবিক কিছু প্রশ্ন কবিকে বারবার তাড়িত করে সেই সব প্রশ্ন, সেই সব আকুলতা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে কবিতা লিখতে, শিল্প সৃষ্টি করতে। নিজের দৃষ্টিতে জগত-জীবন সময়কে দেখার নিজস্ব পদ্ধতিই তাঁকে কবি করে তোলে– সৈয়দ শামসুল হকের কাব্য নিজস্ব অভিজ্ঞতা আর অভিজ্ঞতার আলোয় নতুন দ্যুতি ছড়িয়ে দিয়েছে। ব্যক্তি জীবনের নিজস্ব প্রকরণ–প্রবণতাকে তিনি নিয়ত ধরে রাখতে চেয়েছেন কবিতায়।

কবির হৃদয়ে অবিরাম চঞ্চল্য প্রণোদিত হয়। সেই চঞ্চলতা প্রাণের, আর প্রাণের মূল প্রবণতা হলো দ্যোতনা– প্রকাশ লাভ করবার ইচ্ছে। যে প্রেরণা কবির অন্তর্গতলোকের আলোকে সমুখে বের করে নিয়ে আসে। তাঁকে তিনি ধরতে চেয়েছেন, উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। উপলব্ধির উজ্জ্বলতার তিনি বুঝে নেন এই প্রেরণা চঞ্চলা মেয়ের মতো। যার ভেতরে আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না। পরিপূর্ণ আর নিজের আবেগে তা সর্বদা চঞ্চল।

কবির চেতনার মূলে যে স্বতোৎসারিত প্রবহমানতা তা ভরে উঠতে চায় এক নারীকে কেন্দ্র করে। সেই তাকে প্রেরণা যোগায়। এই চেতনা রোমান্টিক সন্দেহ নেই। তবে, নিজের অস্তিত্বগত চেতনার সাড়াকে প্রকাশ করার জন্য এর চেয়ে সুন্দর উদাহরণ আর কি হতে পারে।

> চেতনার গূঢ় মূলে জল দাও, বীজ,
> শস্য করো চিরকাল, হাসি দাও কান্নার সময়ে,
> উপদ্রুব হৃদয়ের বাঁধ ভাঙো ভক্তির পাবনে;
> চিরকাল বাজাও খঞ্জনি।[৪]

নিজের অস্তিত্বকে নির্মাণ করতে কবির সামনে চলে আসে নিজের শৈশব। যে শৈশব 'পুরনো প্রাসাদের' মতো। জীবনের ক্রমচঞ্চলতার অপসৃত হয়েছে যদিবা সে-সব স্মৃতি তবু বর্তমান কবিকে তাড়িত করে। পূর্ণ পরিণত মানুষের ভেতরে উঁকি দেয় পুরনো শৈশব। সেটা সব সময় উজ্জ্বল নয়। শৈশব থেকে তরুণ হয়ে উঠবার সিঁড়ি কবি দেখেন। প্রেম-কাম-পরাজয় দেখেন। যে-নারী তাকে ভালোবেসে আজ দূরে তার জন্য কবির খানিকটা স্মৃতি কাতরতা ঝরে পড়ে। সব মিলিয়ে পিছনে ফেলা জীবন তাঁকে মাঝেমাঝে বিব্রত করে, অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। শৈশব-যৌবন তাঁকে একটা সময়ের নিটোল আঁধারে নিয়ে যায়।

> এই সন্ধ্যা অতিক্রান্ত বন্দরের জাহাজের মতো।
> একে একে আলো জ্বলে পুরনো প্রাসাদে–
> যে প্রাসাদ শৈশবের অনুজ্জ্বল বর্ণ ছাড়া আর কিছু নয়,
> বাগানে সবুজ মুখ রাত সূর্যোদয়,
> আর কিছু তীব্রতর অনুভূতি নয়,
> শুধু লাল মখমল বিবর্ণ সন্ধ্যায় মতো– আর কিছু নয়।[৫]

পুরনো প্রাসাদে অর্থাৎ কবির স্মৃতির প্রাসাদে আরো ছিল এক নারী। যে নারী কবিকে ভালবেসেও থাকেনি পাশে। কবি তার সব প্রয়োজন মেটাতে পারেন নি। সে-নারী 'আজীবন বারবার বদলেছে সে নাম বদলাতে পারেনি হৃদয়। চব্বিশ বছর ধরেও সে হৃদয় বদলাতে পারেনি। অথচ ভালবেসে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারেনি কবিকে। অথচ তাঁর অপেক্ষা ছিলো করুণ :

> যেন তার আসবার কথা ছিলো, আসবে এখনি,
> এমনকি বেড়ালের সঞ্চরণে উচ্চকিত হয়েছে সে একেক বসন্তে

এবং আবার আনত হয়েছে মাথা
আতঙ্কিত সম্রাটের বর্ণহীন চিত্রের ভঙ্গিতে।[৬]

কবির দ্বিধা ছিল। একটা দোদুল্যমনতা তাকে ঘিরে ঘরেছিল। শিল্পী তিনি, কবি তিনি 'উন্মীলিত গাঢ় বুর্জোয়ার' সুবাস ছড়িয়ে যে-নারী এসেছিল তাঁকে তিনি নিতে পারেননি একান্ত করে। অন্তত কবি হিসেবে সে-নারীকে শব্দ প্রসাধন উজ্জ্বল করতে পারেন সে ক্ষমতাই তাঁর কতটুকু :

সে কথা কোথায় পাব উচ্চারণে যার
শব্দ আর শব্দাবলীর রবে না শুধুই,
রাত্রির আকাশে তাঁরা স্তব্ধতার মহানদী থেকে
উৎসারিত প্রায় দৃশ্যমান একটি বিস্ময় হয়ে
সঞ্চারিত হবে কোটি লোক থেকে লোকে।[৭]

কবির এই চেতনা এক অস্থির যুবকের মনোজগতের ছবি আঁকে। কখনো এই অস্থিরতা তাঁকে নিয়ে যায় ত্রিশের কবিদের কাছাকাছি। মনে হতে পারে ত্রিশের উত্তরাধিকার তিনি বহন করতে চান। তবে তা সাময়িক। প্রকৃতপক্ষে কবির মানসভূমে যে চেতনা প্রসঙ্গ ও জীবনাভিজ্ঞান জন্ম নেয়া নিয়ত তা সব কবির ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে একই বিষয় হিসেবে। সৈয়দ শামসুল হক বেলায় সেটা মনে হয় সত্য।

লক্ষ করা যাবে যে, এই প্রবণতা কবির নিজস্ব প্রত্যয় ও বোধ-সঞ্জাত। প্রকাশভঙ্গিও তাঁর নিজস্ব। তবু বিষয়ের সমতায় দাবি করা যাবে যে এই লক্ষণ ত্রিশের কবিতায় প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর কাব্য-অভীপ্সার তীব্র টানে চলে যান অন্য গন্তব্যে, নিজেকে নির্মাণ করার জন্য তাঁর অস্তিত্ব আর সত্তাকে চিনতে কখনো ভুল করেন না। আমরা অস্বীকার করি না, বরং স্বীকার করি প্রেম, কাম; দ্রোহ, ঈশ্বরহীনতা ও আধুনিক যুক্তিবাদের সকল লক্ষণ তাঁর অস্তিত্বে বহমান। তিনি এ সবকে নিজস্ব ভাবকল্পনার মণ্ডনক্রিয়ায় নতুন আদল দেন, যা হয়ে ওঠে তাঁর একান্ত নিজের শিল্পবোধের ফসল।

অরণ্যের শান্ত–নিস্তরঙ্গ আবহকে কবি আত্মায় ধারণ করতে চান। বস্তুত প্রকৃতি তাঁকে ডাকে না প্রকৃতি বন্দনাকারী কবিদের মতো। বরং তিনি নিজের অনুভব আর অনুভূতি মিলিয়ে নিতে চান প্রকৃতির বৈচিত্র্যের সাথে সাযুজ্য স্থাপন করে।

আমি এক অন্ধকার অরণ্যের মতো
দীর্ঘ, ঋজু, সুপ্রচুর, বিশাল, বিস্তৃত,
মূল কন্দ গাঢ় কান্ত লতা,
জন্তু, কালো, সবুজের সচ্ছলতা
নিয়ে আছি, কিন্তু আছ হতভাগ্য শ্বাপদের শব
ইতস্তত অনিবার্য...।[৮]

সৈয়দ শামসুল হক আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের পাঠ গ্রহণ করেছেন মনে প্রাণে। দৈহিক ও মনোজগতের অবাধ বিচরণে তিনি সিগমণ্ড ফ্রয়েডের তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, বস্তুবাদী দর্শনে তাঁর আস্থা রয়েছে। এ সমস্ত কারণে তার প্রত্যয়ের কোনো সীমানা নেই, কোনো জাগতিক, ঐহিক কুসংস্কারজাত তাঁকে থামিয়ে দিতে পারে না। তিনি মানবিক প্রকরণে যথেচ্ছা বিহার করেন স্বচ্ছন্দে। ধর্মীয় বিশ্বাসের ঈশ্বর তাঁর কাছে ঠুনকো, নিছক আবেগের মনে হয়, আধুনিক কবির কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। তিনি নিজেই তো স্রষ্টা। সুতরাং পরিকল্পিত বা আরোপিত কোনো সত্যে তাঁর বিশ্বাস নেই। আত্মতুষ্টির প্রয়োজনে সব অভিপ্রায়কে তিনি চালিয়ে দেন সহজে।

এ হলো ঈশ্বর,
এ হলো এমন কিছু যা কয়েকটা চোখের পরে শুয়ে তাকে–

একে রাখবে না–
একে থাকবে না সুটকেসে,
শেল্‌ফে,
রান্নার আগুনে। কেবলি
ফুলে উঠবে সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়ানো আমাকে ডিঙ্গিয়ে
কেবলি ফুলে উঠবে–[৯]

জীবনের আরম্ভ, স্থিতি প্রত্যাবর্তন ইত্যাকার বিষয় তাঁকে তাড়িত করে। ইশ্বরহিনতা যেমন তাঁকে ভাবায়, মৃত্যুও তাঁকে চঞ্চল করে মানবীয় প্রকরণ হিসেবে। তেমনি হতাশ আর শূন্যতাও তাকে ঘিরে ধরে।

আমি জানি
এ শহরে কোনো নম্রমুখ রুটিওয়ালা নেই–
যেখানে এসেছি
এ শহরে নেই সেই জাতিস্মরে গুড়ি।
শুধু পাথরের পথে,
আর দু'পাশে দালান,
ওপরে নদীর মতো দীর্ঘ আকাশ।
এইতো ছেলেগুলো জানালায় রঙীন রুমাল নিয়ে,
আর ওইতো মোটাসোটা বউগুলো হাঁ করে ঘুমায়,
আর শুকনো কপি নিয়ে খেলছে বিড়াল।[১০]

এই চিত্র আধুনিক মানুষের জীবনযন্ত্রণা, ক্লান্তি ও অনবরত অবসাদের কথা বলে। নিরাসক্ত জীবন এখানে খুঁজে পায় না স্বস্তি, সদর্থক জীবনবোধ এখানে নষ্ট হতে বসেছে। জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক বোধের ক্রমসম্প্রসারণের এক পর্যায়ে চলে আছে। মৃত্যু চেতনা। ক্লান্তি-অবসাদ-ক্লেদ-মৃত্যু সমান প্রতিকূলতা আর যন্ত্রণা-বিবিক্তি নিয়ে আসে।

সৈয়দ শামসুল হক নিজের শিল্পভুবনের আসর গড়ে তোলেন নিজস্ব বিষয় আর নির্মাণ কৌশলে। অস্তিত্বকে উললব্ধি করেন, সেখানে তিনি কবি, শিল্পী আর প্রেমিক। এই ত্রিবিধ সত্তার সন্নিপাতে মোহন এক বাক্‌ভঙ্গিমার জন্ম হয় তাঁর কবিতায়, নিজেকে ফিরে পান, তাঁর জীবনের সাথে সহজ সরল আর গভীর সব অনুষঙ্গকে সূক্ষ্ম বোধজাত অধীরতার কম্পনিনাদে ভরে তোলেন, ভুলে যান শিল্পের সীমানা। বরং নিখাদ আর সুপ্রতুল এক আবহ নির্মাণ করতে থাকেন যা তাঁর নিজস্ব। কবিতা, কবি, প্রেম, দেহ–সংসর্গ ইত্যাকার বিষয়কে মানবীয় বোধের সাথে অন্বিত করে তাঁর নিজস্ব চেতনা নবমাত্রায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।[১১] কবিতাকে তাঁর প্রাণের স্পন্দন ভেবে নেন, ব্যবহার করতে থাকেন সহজলভ্য অথচ উত্তীর্ণ এক শিল্পকলা। চেতনার গভীরতায় তিনি স্পষ্টত দেখতে পান তাঁর ভেতরের সব স্বাদ, আগ্রহ, বিকার আর অনবরত পরিবর্তনশীল এক প্রবাহ; যে-প্রবাহের ধারায় জীবনের আরো বিচ্ছুরিত হয়, অন্ধকার নেচে ওঠে। কাব্যবোধের আলোক নিয়ে কবি অনবরত খেলা করেন।

আমি সহস্রের হাতে সমর্পণ করেছি
আমার অস্থির আঙ্গুল;
যখন তোমার চোখ থেকে উদগত হচ্ছে উষ্ণ অশ্রুর ধারা
আমি একটি তরুণীর মতো ঋজু হয়েছি
ধাবিত হবার জন্য।
এবং যেহেতু আমার শক্তি কতগুলো শব্দে
আমি সমস্ত শরীরের মধ্যে অনুভব করেছি

জলন্ত ধ্বনি সমূহের নির্গম
আর একটা পূর্ণিত আলোক-পিণ্ডের শুভ্র বিচ্ছুরণ।[১২]

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর কবিতায় নিজেকে সত্যিকার শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবির স্বার্থসিদ্ধির কোনো প্রয়োজন নেই, অথচ মানব সমাজের সব মানুষের ভেতরের সব আকৃতি তাকে ডাকে। প্রাণ প্রবাহের স্বতঃস্ফূর্ততা নেই বলে কবি এখানে স্থায়ী দাঁড়াতে আসেন নি। তবু সব মানুষের মধ্যে দিয়ে তাঁর ভ্রমণ। পর্যটক তিনি, স্তরে স্তরে সঞ্চিত করে নিতে চান নিজের সঞ্চয়। প্রবহমান সময় তাঁর অন্যতম উপাদান, আর মানুষ তাঁর হৃদয়ে স্পন্দন। যদিও শিল্পীর লক্ষ আলাদা, তবু মানুষই তার প্রকৃত আশ্রয়। এই বাংলাদেশের দুঃসহ সময় ও জীবনকে তিনি দেখেছেন, তাঁর হৃদয় যন্ত্রণায় নীল হয়ে ওঠে।

শিল্পীর সত্তা তার নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়। তিনি নিজেই সহজভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নিজের অভিপ্রায়। সারা জীবনের অভিজ্ঞতার সারৎসার নিয়ে তিনি তৈরি করে ফেলেন নিজের চলার পথ। নিজস্ববোধ, সংজ্ঞা, অভিজ্ঞান আর অভিপ্রায়কে বুঝে নিয়ে তাঁর শিল্পচেতনা গড়ে ওঠে। তিনি গড়ে তোলেন স্বতন্ত্র, বর্ণিল এক জগৎ যা ভাষা আর অনুভবের কারুকার্যে স্থায়ী রূপলাভ করে।

আমাকে দেখতে পাবে সন্ধ্যার ভেতরে একা বসে আছি
যখন সংসার থেকে আলো এসে সড়ক ভেজায়;
আমাকে দেখতে পাবে ঘুমের ভেতরে আমি একা জেগে আছি
যখন স্বপ্নের ছবি তোমাদের চোখ চিরে দেয়;
আমাকে দেখতে পাবে ভোরের ভেতরে আমি অনাহারে আছি
যখন নারীর কাছ মানুষেরা দু'হাত বাড়ায়;
এবং দেখতে পাবে রোদের ভেতরে আমি সারাদিন আছি
যখন সকলে গেছে সকলের নিজস্ব ছায়ায়।[১৩]

কবির সত্তা সবার থেকে ভিন্ন। পৃথিবীর সব যন্ত্রণা তাকে আক্রান্ত করে, পীড়িত করে। আর তিনি জানেন জীবন ও জগতের জটিলাবর্তে কবির স্থান কোথায়। কবির স্থিতি, প্রাঙ্গণ, আর সামূহিক সম্ভাবনা তিনি জানেন। জীবনের নির্বেদ আর যন্ত্রণায় আমূলবিদ্ধ কবিতে তৈরি করে নিতে হয় কণ্টকাকীর্ণ নিজের পথ। কবির কাছে সামাজিক দাবির তাই কোনো যৌক্তিকতা নেই, তাঁর মানসভূমে রচিত হয় সময়ের কালছায়া, জীবনানন্দ, আর আশা-নিরাশার দোলায় দোদুল্যমান জীবনের নেতিবাচক বিস্ময়। সৈয়দ শামসুল হক কবির নির্মাণপথ আর প্রকৃত সত্তার পরিচয় তুলে ধরেন তাঁর কবিতায় এবং এখানে তাঁর শিল্পময় উচ্চারণ কবি সত্তার অপূর্ব দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে অথচ কবির চেয়ে আর কে এমন জানে কবিতাই অন্ধ ছেলে তাঁর?

একমাত্র সেই জানে করো কণ্ঠে অলৌকিক কোনো পাখি নেই।
একমাত্র সেই জানে, বৃত্ত ছাড়া জ্যামিতির উপপাদ্য নেই।
একমাত্র সেই জানে, সব কিছুই একই সঙ্গে নিশ্চল, অধীর।
কেবলি উদ্যম আর কেবলি বিনাশ;
কেবলি ভাঙন আর কেবলি নির্মাণ;
কেবলি বিদায় আর কেবলি সাক্ষাৎ;
কেবলি সংসার আর কেবলি শ্মশান।[১৪]

নিজের কবি-জীবন আর কাব্যকে বারবার কবির কাছে নতুন জটিল বিষয় মনে হয়। শিল্প জগতে সংসার করতে তিনি নিজের ব্যক্তি জীবনে শিল্পী হয়ে ওঠার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। একজন কবি কীভাবে গড়ে ওঠেন, কীভাবে প্রতিনিয়ত নিজের ভেতর ভাঙন চলে, কীভাবে

কাব্যবোধ তাকে পলে পলে উদ্বেলিত করে। আর সমগ্র জগত তাঁর কাছে কীভাবে অভিনব হয়ে ওঠে তা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কাব্য 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালায়'। এটি একটি কাব্য, তবে মূলত একটি দীর্ঘ কবিতা। শিল্পসত্তার নানা প্রসঙ্গ এখানে এসেছে, এসেছে ব্যক্তিগত অনুভবের সাথে কাব্যলোকের সম্পর্ক সাযুজ্য দ্বিধার প্রসঙ্গ। ভাষার প্রতিভার আগুন কীভাবে কবিকে সতত উচ্চকিত করে, তাকে কীভাবে গ্রহণ করেন, কীভাবেই তা পরিণত করেন শিল্পে– সে প্রসঙ্গ এসেছে এ কবিতায়। দৃশ্যত মনে হতে পারে, এটা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাচরণের খসড়া, সুতরাং সঠিক শৈল্পিক চেতনা ও বোধ এখানে অনুপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে জীবন-সংসার, প্রেম-শিল্প ও শিল্পের ক্রমসম্প্রসারণ এসব এই কাব্যের বিষয়বস্তু। চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্তে লেখা এই দীর্ঘ কবিতায় কবির কাব্য সুষমার স্থায়ী রূপ ধরা পড়ে। দীর্ঘক্ষণ কবিতার সৌন্দর্যবোধ ধরে রাখা কবির পক্ষে কষ্টকর। অন্তত সে রকম শক্তিশালী প্রতিভা খুব কম কবির থাকে। বাংলা ভাষার এ জাতীয় কবিতায় তা পরিলক্ষিত হয়ে এসেছে। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর কাব্য-প্রতিভার এক অনন্য স্বাক্ষর রেখেছেন এই কবিতায়। কবিতার সৌকর্যবোধ সম্পর্কে তাঁর ধারণা দৃঢ়মূল হওয়াতে এই দীর্ঘ কবিতাও তাঁর শিল্প-সাফল্যকে ধরে রেখেছে।

প্রথমত কবি একটা দ্বিধার কথা বলেন যার অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে কবির এক ধরনের ইঙ্গিতময় বাণী। একজন কবি আশৈশব 'শোকগ্রস্ত জননীর মতো' যা লেখেন সবটাই কবিতা নয়। বরং কবিকে একটা কঠিন পরিমিতিবোধের দেয়ালের ভেতরে থাকতে হয়। তবু, অনিবার্যভাবে জীবনের নানা সূক্ষ্ম উপাদান কবিকে উত্তেজিত করে, অক্ষরের ঘাড়ে ভর দিয়ে 'বেজে উঠতে চায় চরণে'। কবি সেই সব দিনে কাব্যচর্চা আর শিল্প বিকাশের পর্যায়ে নিজেকে বিকশিত আর শিহরিত হতে দেখেছেন। সাময়িক জীবনের নানা ক্লেদাক্ত দিক ফুটে উঠেছে এ কবিতায় ব্যক্তি কবির ভনিতায়। সামাজিক অস্থিরতা, নিসঙ্গতা, কামুকতা-লোলুপতা আর সার্বিক মানবিক বিপর্যয়ের ভেতরে একজন কবির সত্তা কীভাবে নির্মিত হয় তাঁর চিত্র রয়েছে এ কবিতায়। কবির ভেতরে কবিতার ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে পড়ে এভাবে–

যখন একাকী থাকি,
সন্তর্পনে খুলি আমার পুরনো বই,
যখন ভিখিরি নামে নিভন্ত তন্দুরে
রাতে, নিজের দেরাজে এখনো সযত্নে,
যখন রাজত্ব শুধু কোমল জলের;
মধ্যরাতে শব্দ তুলে যায় দ্রুতযান,
স্মৃতিগণ আসে তারই মতো হু হু করে -[১৫]

কবিতার সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করেন কবি। তাঁর নিজের জীবনে ছবি হয়ে ওঠার এই দীর্ঘ কবিতায় তিনি বলেন সেই সত্য। যার উচ্চারণ সহজ, উপলব্ধি কঠিন, আর শিল্পসত্তার অন্তর্নিহিত গহন থেকে ধরে নিতে হয় তার শরীর।

সরল রৈখিক নীল কঠিন ইস্পাত
হয়ত নোয়াতে পারো। কিন্তু কবিতার
সাথে নদীর তুলনা কেউ কেউ দিয়ে
থাকলেও আসলে সে স্বপ্ন-ভাগিরথী
শরীরে ধরে না জল। তরল হীরক
প্রতিভার সরোবর থেকে কলকণ্ঠে
নেমে আসে পিঙ্গল জটায়, পৃথিবীকে
শস্যের সংবাদ দিয়ে অন্তর্গত হয়
লোকে লোকে স্মৃতির সাগরে।...[১৬]

সামাজিক অস্থিরতা, নানা অনাচার কবিকে উদ্বেলিত করে। এই দ্রোহচেতনা তাকে বিদ্রোহী করে তোলে, তবে প্রতিবাদ করে বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে। বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিবছর যে রুগ্ন চিত্র তাও তাঁকে ক্লিষ্ট করে। সামাজিক জীবনের নানা সমস্যা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং পারিবারিক জীবনের বিপর্যয় সারা বাংলায় যেভাবে দেখা গেছে তা এই কবিকে উদ্বেলিত করে। এই কবিতা মূলত তৎকালীন বাংলাদেশের এক অগ্নিঝরা সময়কে ধারণ করে। কবির সত্তায় এই সময় ব্যক্তি-প্রতিক্রিয়ার সংস্পর্শে কবিতার শরীরে প্রকাশ লাভ করেছে। কবি যেন বাধ্য হয়েই সামাজিক-রাষ্ট্রিক এই ক্লেদাক্ত ছবি আঁকেন। কারণ জীবনের সঙ্গে লীন এই সব আবহ তিনি একজন মানুষ হিসেবে, শিল্পী হিসেবে অস্বীকার করতে পারেন না।

... তবু লিখি, লিখে যাই, সম্ভবত
এই কি কারণ-আঠারো বছর ধরে
যা শিখেছি তা সহজে ভোলা তো যায় না
অথবা চল্লিশ আর বেশি দূরে নয়,
বস্তুত সম্ভব নয় এখন নতুন
কোনো বিদ্যার সাধনা
...
উপমা ভোলায় ঘুম, চিত্রকল্প নেশা;
শব্দ হয় সদ্য দেখা মেয়েটার মতো;
তার সাথে অন্ধকারে লম্বমান হই,
ঠোঁট চুষি, শিহরাই, ত্বকে, লোমকূপে
রকেট নিলীমা ছিঁড়ে। আজো লিখে যাই।[১৭]

সামাজিক অস্থিরতা কবিকে সর্বদা আলোড়িত করে, মূলত এক অস্থির সময়ের সাক্ষ্য বহন করে তাঁর কবিতা। নিজের ব্যক্তি জীবন আর বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থান একাকার হয়ে যায় শিল্পীর হাতে। তাঁর ইচ্ছেমত কিছুই হয় না, স্বদেশের বুকে প্রতিক্ষণে আসে নানা দুর্বিপাক। সবকিছুতে স্বাভাবিকতার আস্তরণ পড়ে, মানুষের আগ্রহ কমে যায়, গতানুগতিকতার নির্বেদে চোখ বুঁজে পড়ে থাকে, কোনো চঞ্চলতা, বিকার দেখা যায় না।

পর্যবেক্ষণ আর পর্যটক তিনি। তিনি দেখেন বাংলার জীবনচিত্র, নিসর্গ পরিবর্তন। সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তন তাঁকে আহত করে। দেশবিভাগের পর বাঙালির একটি অংশ ভারতে চলে যায়। তারা গেছে কেউ আত্মীয়-স্বজন, আপন ভুবন, বাড়ি-ঘর ফেলে। চলে যেতে হয়। দীর্ঘ এই কবিতায় বাংলার ছবি এঁকেছেন, সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেন আমাদের ভাঙন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ভাঙন তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করে। শিল্পে সংসার তাঁর, তাই কাব্যবোধ তাঁকে মুক্তি দেয় না। বরং আমাদের চারপাশের এই ক্রম-নিম্নগামী অবস্থা তাঁর চেতনকে জাগিয়ে তোলে। কারণ এই সমাজের একজন সদস্য তিনি, এই দেশের জল-বাতাস প্রকৃতি গড়ে তুলেছে তাঁর মনন। তাই সামগ্রিকভাবে বাঙালির মননে যে পরিবর্তন ঘটে, যে ধারাবাহিক জীবন প্রবাহ ধরে রাখে বাংলার ভৌগলিক অবস্থানে, কবি তা ধারণ করেন হৃদয়ে আশৈশব স্বপ্নের শহর ঢাকা, বিপণিবিতান, সড়ক, যেখানে 'এক ঝাঁক মেয়েদের মতো হাসতে হাসতে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি', পাবনার শাড়ি, বাজারের সেরা ক্রিম, সব কবিকে বিস্মিত করে, ভেতরে জন্ম নেয় নতুন মহাদেশ। তাঁকে দেখতে হয় কারণ দু-টো চোখ ছাড়া তাঁর আর কিছু নেই এমন অসহায় তিনি, আর প্রতিভার আগুন তাঁর হাতে দিয়েছে কেউ তাতেই সবকিছু হয়ে উঠেছে অভূতপূর্ব এক সৃষ্টি।

এর ভেতর থেকে কবি হয়ে ওঠেন তিনি। বাংলাদেশের সঙ্গে সারা বিশ্বের শিল্পসভ্যতার যোগসূত্র খুঁজে ফেরেন। যৌবনের অস্থিরতা আর চাহিদা মেটান সুরার উন্মাদনায়, আর

বেশ্যার সাহচর্যে। উন্মাতাল হয়ত মনে হবে কবিকে। তবে বাংলাদেশের এই যুবকের ছবি তাঁর ব্যক্তি জীবনের ছবি ভাবা ভুল হবে। কারণ তিনি বলেন–

মেরুদণ্ডে হিমবাহ বয়ে শহরের
বুকে উত্তর দক্ষিণ আমি ক্ষ্যাপা ট্রাক
বেড়িয়েছি ছুটে। স্বপ্ন ও বিভ্রম ছুঁয়ে
মেপেছি মুহূর্তগুলো পিসার গীর্জায়
অবিরাম। রাত্রি গেছে রমণে বমনে,
দিন বেড়ালের ঘুমে। একাকার হয়ে
গেছে ডাবলিন ঢাকা। পুরানা পল্টনে
উড়ে গেছি বার বার অ্যালবাট্রসের
বিশাল পাখায়।[১৮]

এই মুহূর্তগুলো ধরে রাখার জন্য কবির এই সব বর্ণনা ও প্রসঙ্গ। মূলত স্বপ্ন ও বিভ্রমের মধ্যে ডুবে আছে বাংলাদেশ, অজ্ঞানতা-অন্ধকার, কুসংস্কার আর সাম্প্রদায়িকতায়। ব্যক্তি কবির সত্তা সেখানে স্থির সমাহিত হতে পারে না। তবে, এক নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তিনি সবকিছু দেখেন। গভীর দৃষ্টি আর মানবিকবোধের ছটায় সামাজিক-অধঃপাতকে তিনি কবিতার শরীরে ধারণ করেন।

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর কবিতায় নানাবিধ অনুষঙ্গকে অন্বিত করেছেন। বিষয় হিসেবে কবিতাকে বা কাব্যগ্রন্থকে শ্রেণিকরণ করা বেশ কঠিন। তবু, প্রেম-প্রণয়-সংরাগ তাঁর অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে সনাক্ত করা যায়। 'বৈশাখের রচিত পংক্তিমালা'য় তাঁর জীবন-প্রত্যয় ও জীবন যাপন-স্বপ্ন সম্ভাবনার কথা স্পষ্ট। প্রেম সেখানে এসেছে অন্য উপাদনের সাথে অন্বিত হয়ে. প্রেম সেখানে মূলত সংরাগ-উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের অমিতাচার। প্রথম পর্যায়ের কাব্যে তাঁর প্রেম. রোমান্টিক চেতনার প্রকাশ হিসেবে ধর্তব্য। প্রেমকে নানামাত্রায় জীবনের গভীরতার সঙ্গে সংযোজন করেছেন। সামগ্রিক জীবনের তাৎপর্যগত পরিবর্তনের সাথে সাথে তাঁর প্রেম চেতনার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে নানা ভঙ্গিময়। ক্রমাগত তিনি একেকটা পর্যায় যেন অতিক্রম করেছেন। প্রথমত তাঁর প্রেম বিকশিত হয়েছে রোমান্টিক আবহে :

ক. চেতনার গূঢ় মূলে জল দাও, বীজ,
শস্য কারো চিরকাল, হাসি দাও কান্নার সময়ে
উপদ্রুত হৃদয়ের বাঁধ ভাঙো ভক্তির প্লাবনে;
চিরকাল বাজাও খঞ্জনি।[১৯]

খ. যে আমাকে ইচ্ছে করেছে,
আমি তার;
আর যে আমাকে করেনি,
আমি তারো।
প্রেম একটা জীবনের মতো, জীবন অনেকের[২০]

প্রেম-ভালোবাসাকে সূক্ষ্মতম উপমায় তুলে ধরেন তিনি। বস্তুত কোনো বস্তুগত উপমা নির্মাণ তিনি করেন না। বোধজাত অধিরতাও কখনো কখনো প্রকাশ পায়। তবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই দেখেন সবকিছু :

সিঁড়ি দিয়ে নাবছো তুমি তখন থেকে,
তোমার দু'হাত ভরে আমার চোখের ছায়া পাঠিয়ে দিয়েছি,
যতবার ধুলো থেকে নিয়েছি গোলাপ

ততবার তা পড়ে গেছে–
প্রেম তোমাকে রৌদ্রের নিচে জ্বলজ্বল করতে থাকা সমুদ্র দিয়েছে।[২১]

কবি তিনি, শিল্পী তিনি, আবার একই সাথে প্রেমিক। শৈল্পিকতা কীভাবে উপলব্ধি করে প্রেমিকাকে, প্রেমিক তার দয়িতাকে গ্রহণ করবে কীভাবে, কতটুকু দাবি তার তা নিয়েও কবির থাকে সংশয়। শব্দ কবির একমাত্র হাতিয়ার, তা দিয়েই তিনি কি পারবেন প্রেমিকার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে? শিল্প-আকাঙ্ক্ষা-প্রেম-ভালোবাসা এইসব অতি নিকটতম অনুষঙ্গ নতুন উপাদান হিসেবে ধরা দেয় সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায়। মূলত প্রেমকে নতুনভাবে নির্মাণ করার প্রয়াস তা :

আমার কি সাধ্য আছে আজীবন শব্দ প্রসাধনে
তিলে তিলে গড়ে তুলি তাকে?
যদিও আমাকে তুমি সচতুর শিল্পী বলে জানো,
জানে লোক, আমার তো সাধ্য নেই জানি।
সেকথা কোথায় পাব যার উচ্চারণে যার
শব্দ আর শব্দাবলী রবে না শুধুই,
রাত্রির আকাশে তারা স্তব্ধতার মহানদী থেকে
উৎসারিত হবে কোটি লোক থেকে লোকে।[২২]

কবির সত্তাকে, শিল্পীর সত্তাকে প্রেমের এক বিপ্রতীপ ধারায় সনাক্ত করতে চান সৈয়দ শামসুল হক। এভাবে শৈল্পিক সত্তার সাথে প্রেমিক সত্তার দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কের রহস্য উন্মোচিত হয়। অনিবার্য শিল্পবোধের তাড়নায় শিল্পী-কবি মত্ত। সে মত্ততায় অবিরাম ভাঙা-গড়া-বিনাশ-নির্মাণ লক্ষ করা যায়। ধ্বংশ-আর সৃষ্টি কবির আত্মায় সহাবস্থান করে। প্রেমিকাকে তাই কবি সাবধান হতে বলেন। সৈয়দ শামসুল হক কবির মানব চেতনে নিবিড় প্রেমের ছবি তুলে ধরতে চান। তাঁর বোধ রোমান্টিক, তবে তা গভীর ও সূক্ষ্ম দ্যোতনা প্রকাশ করে; বেরিয়ে আসে একাকী নিঃসঙ্গ কবির আত্মচেতনার রূপ–ধ্বংশাত্মক মানব মন যা অনবরত সৃষ্টি যন্ত্রণায় নীল :

তাকে যদি কাছে ডাকো, যদি তার চোখে রাখো চোখ,
তাকে যদি কাছে আনো, যদি তার হাতে রাখো হাত–
তোমার সমস্ত সুখ স্বস্তি ছিঁড়ে কংকালের মুখ উঁকি দেবে,
তোমার বাগান থেকে আনাজের বীজ মরে যাবে,
তোমার শস্যের খেতে পংগপাল এসে ভরে যাবে,
...
তার চেয়ে কবিকেই ঘুমহীন নদীর পাড় ঘেঁষে হেঁটে যেতে দিও সারারাত,
কবিকেই দিও তুমি একাকী শোকার্ত হতে, যে শোক তোমার;
শূন্যতায় ভার দিও, যে ভার তোমার;
যেতে দিও সেই পথে কবিকেই, যে পথে সাহস নেই তোমার যাবার।[২৩]

আবার, কবি প্রেমিকার কাছে খুঁজে পান তাঁর কাব্যবীজ। প্রেম জীবনের শাশ্বত প্রেরণাও বটে। সৈয়দ শামসুল হক প্রেমিকাকে সাবধান করে দেন কবি থেকে দূরে থাকতে, তিনিই জানেন জীবনের অমিত শক্তি-সাহস-ক্ষেত্র প্রেমিকা তার প্রেম। নতুন করে শক্তি পান প্রেমের কাছে যখন অন্য সব সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়

তাহলে আমার ইতি? তাহলে রাজত্ব শুধু কংকালের? এখানেই তাহলে কবর?
অথচ অমল তুমি, শস্য তুমি, তুমি রৌদ্র শীতল ধৌত জনপদ,
আমার সুস্বাস্থ্য তুমি, নিক্ষেপিত নভোযান, প্রতিভার অস্থির লাঙল।
দৃষ্টি যাতে অবসন্ন সেই জল ভেদ করে তোমাতেই গন্তব্য আমার।[২৪]

সৈয়দ শামসুল হক তার প্রেমবোধের সাথে বিরহকে উপলব্ধি করেছেন, তবে এর মাত্রা কম। বলা চলে, বিরহের কবিতা তাঁর রচনার দুর্লক্ষ্য। তবু, তিনি বিরহকেও তুলে ধরেন জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে। বিশেষত প্রেম-এর বিপরীত মেরুতে থাকে বিরহ। তিনিও সেটা অনুভব করেন। বাংলা কবিতার প্রেম-বিরহ খুব কাছাকাছি বিষয় হলেও এই কবি তাকে নির্মাণ করেছেন অন্যভাবে। আলংকারিক প্রয়োগে তাঁর বিরহ ও প্রেমিকার বিচ্ছেদ ব্যথা আলাদা মূল্য পেয়েছে। গতানুগতিক নয়, বরং আধুনিক মানস চেতনার বহিঃপ্রকাশ ধরা পড়ে এসব পংক্তিতে :

আমাকে ফেলে কোথায় তুমি যাবে?
যেখানে যাও অন্ধ-বন, লক্ষ তারার রাত,
ব্যাথার মতো বাতাস বয়ে যাবে।
আমাকে তুমি এড়িয়ে বলো কেমন করে রবে?[২৫]

সৈয়দ শামসুল হক আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রেমের কবিতায় যুক্ত করতে চেয়েছেন। গ্রামীণ জীবন, ভাষা, বিশ্বাস ও সামগ্রিক জীবনের প্রেমের বৈচিত্র্যকে তিনি নতুন অনুষঙ্গ করেছেন। এটা একটা নিরীক্ষাধর্মী কাজ। তাঁর শিল্পতাত্ত্বিক সফলতা নিয়ে কথা বলা যেতে পারে, তবে আমরা লক্ষ করব যে, 'পরাণের গহীন ভিতর' (১৯৮১) মূলত সনেট হয়েও স্বাভাবিক ও শাশ্বত প্রেমের কবিতা হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি তিনি মানববোধের চিরন্তন বোধের সাথে যুক্ত করেছেন প্রেম। প্রেম সেখানে বিরহ, সংরাগ এবং নানা তাড়নার দ্বারা বিশিষ্টতা পেয়েছে। এই কাব্যে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হলেও সাধারণ শিষ্ট ভাষারও ছোঁয়া রয়েছে। আধুনিক কবিতা থেকেও তা খুব দূরে নয়। 'পরাণের গহীন ভিতর' কাব্যের সনেটগুলোর মধ্যে একটা সাযুজ্য ও ঐক্য রয়েছে। ৩৩টি সনেটকে কবি ঐক্য সূত্রে গেঁথেছেন। নারী ও পুরুষ উভয়ই এখানে কথক। তবে, পুরুষ কণ্ঠ বেশি উচ্চকিত বলে মনে হয়। প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে প্রেম ভালবাসা বিচ্ছেদ-অবিশ্বাস ও নানা খুটিনাটি খুনসুটির পরিচয় আছে বিভিন্ন সনেটে। গার্হস্থ্য বিষয় নয়, বরং প্রেমের বৈচিত্র্যপূর্ণ রসসম্ভার ফুটে উঠেছে গ্রামীণ বাস্তবতায়। গ্রামীণ বাস্তবতার জন্য তিনি অনেক সময় আপাত অশোভন অথচ প্রচলিত ভাষা ও ব্যবহার করেছেন। নানা মাত্রার অন্যতম একটা দিক হল দয়িতার বিরহ। প্রেম-ভালোবাসা-দেহসংসর্গের মধ্যে আছে বিচ্ছেদ স্থায়িত্বের বিপরীতে ক্ষণস্থায়ী এক নির্মিতি যা প্রেমকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। এ কাব্যের নারী বলছে :

আমি কার কাছে গিয়া জিগামু সে দুঃখ দ্যায় ক্যান,
ক্যান এত তপ্ত কথা কয়, ক্যান পাশ ফিরা শোয়,
ঘরের বিছন নিয়া ক্যান অন্য ধান খ্যাতে রোয়?[২৬]

পুরুষ প্রেমিক সমান অনুভব-বেদনায় অস্থির। সেও দয়িতার অনুপস্থিতি অনুভব করে প্রতিনিয়ত। তার অনুভর অস্থিরতায় ভরা, পৌরুষের চিহ্ন প্রতিটি উচ্চারণে। সৈয়দ শামসুল হক পাঠককে তাদের অজান্তেই নাটকীয়তার দোলা দিয়েছেন। কাব্যনাট্য রচনার সময় তাঁর ভেতরে নাটকীয়তা শক্তিশালীভাবে অবস্থান করে। তাঁর অন্যান্য কবিতায়ও নাটকীয়তা লক্ষ করা যায়। 'পরাণের গহীন ভিতর' কাব্যে গভীরভাবে লক্ষ করলে নারী ও পুরুষ দুটি চরিত্র ও তাদের সংলাপ-মতামত-অনুভব পাওয়া যায়। এভাবে কবি মূলত গ্রাম্য মানুষের চালচিত্র জীবনযাত্রা ও প্রেমবোধকে তুলে ধরা সুযোগ নিয়েছেন। পুরুষ প্রেমিক তার অনুভূতি ব্যক্ত করেছে এভাবে :

আমারে অস্থির করে বুঝি না কে এমন খেলায়,
আমার বেবাক নিয়া শান্তি নাই, পাছে পাছে ফেউ।

পানির ভিতরে য্যান ঘুন্নি দিয়া খিল খিল হাসে
যত চোর যুবতীরা, গেরামের শ্যাষ সীমানায়
বটের বৈরাগী চুল, ম্যাঘে চিল হারায় বারায়,
বুকের ভিতর শিষ দিয়া সন্ধ্যা হাঁটে আশেপাশে।[২৭]

বাংলা কবিতায় ইন্দ্রিয়ানুগত্য ও ভোগাসক্তির সঙ্গে প্রেমের কবিতায় যোগ থাকরেও আমাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে তা প্রায়শ উপেক্ষিত থেকেছে। তবু, প্রেম, শরীর, কাম, এসব জীবনের অঙ্গ এবং তা তীব্র আবেগকে ধারণ করে। সেকারণে, বাংলা সাহিত্যের বিশেষত কবিতার সমস্ত যুগে এর উদাহরণ পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণে। লক্ষ করার বিষয় যে, রোমান্টিক প্রেমই একমাত্র আরাধ্য নয় মানবজীবনে; মানবজীবনে তাই অনিবার্যভাবে এসেছে দেহ-সংসর্গের আকর্ষণ। ত্রিশ দশকের কবিতায় আমরা অজস্র উদাহরণ পাই। ইউরোপীয় কবিতায় আমরা এরকম অজস্র উদাহরণ পাই। এ প্রসঙ্গে ডি.এইচ. লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০) এর কবিতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি জৈবিক ক্ষুধাকে উদরপূর্তির চেয়ে আরো গভীর বলে উল্লেখ করেন। সৈয়দ শামসুল হক ত্রিশের দশকের কবিদের অনুসরণ করেছেন এরকম ভাবা সহজ। তবে, আমরা সঠিকস্থানে তুলনামূলক আলোচনায় দেখব যে, তাঁর এ জাতীয় কবিতার বক্তব্য ও উপস্থাপন রীতি স্বতন্ত্র, এমনকি বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকে যে একগোষ্ঠী কবির আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যেও আলাদা। আমরা উদাহরণ হিসেবে শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) ও আল মাহমুদের (জ. ১৯৩৬) নাম উল্লেখ করতে পারি। প্রেমের কবিতার একটা পর্যায় হিসেবে এটাকে শনাক্ত করা চলে, আবার সামগ্রিক-অভিপ্রায় বা সংবেদন হিসেবে একে উল্লেখ করা চলে। মোটকথা, তিনি এজাতীয় কবিতা রচনায় একটা আলাদা ভঙ্গিমা ও বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন বলা যায়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা সময়ের প্রবাহমানতায় নানা দিকে বাঁক নিয়েছে। বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের প্রতিষ্ঠার পথ বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে অত্যাচারী শাসক শ্রেণি দ্বারা। ইংরেজ উপনিবেশ থেকে মুক্তিলাভের পরও আমাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি সত্যিকার অর্থে। এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশেও প্রগতিশীল ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিপন্ন হয়েছে বারবার। আমাদের জাতীয় জীবনের এই ঘাত-প্রতিঘাত শিল্প ও সাহিত্যে নবরূপে নির্মিত হতে থাকে। এ সময়ের লেখকরা তাঁদের স্বদেশ ও স্বদেশের নানা রাজনৈতিক পটপরিবর্তন দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। সাতচল্লিশের দেশবিভাগ, বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের গণআন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষের সামগ্রিক জীবন ধারায় ব্যাপক সাড়া জাগায়। পঞ্চাশের দশকের অন্যতম কবি হিসেবে সৈয়দ শামসুল হক এ সময়কে ধারণ করেছেন তাঁর কবিতায়। তিনি কবিতায় নিরীক্ষা ও নবমাত্রা আরোপের উপর গুরুত্ব দিলেও স্বদেশ, স্বদেশের ইতিহাস ও ইত্যাকার জাতীয় ঘটনা তাঁকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছে। আমরা লক্ষ করব যে, '৪৭-এর দেশবিভাগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত নানা রাজনৈতিক ও অন্যান্য আন্দোলনের পরিচয় তাঁর কবিতায় রয়েছে। সেটা শুধুমাত্র উল্লেখ নয়। তিনি গভীর তাৎপর্যময় করে তুলেছেন এসব বিষয়কে। স্বদেশ তাঁকে আলোড়িত করেছে জননীর মতো। তিনি জননীর স্নেহশীল আকর্ষণ আর গভীর মমত্ববোধকে আবিষ্কার করেন জন্মভূমির ভেতরে। দুই সত্তাকে একাকার করে তোলেন কবিতায়। জননী হয়ে ওঠে বীর যোদ্ধার শক্তির আসল প্রেরণা :

জননী, শ্যামল তুমি বুকে দোলে রূপোর হাঁসুলি–
রাতের আকাশে যেন চাঁদ খেলা করে;
তোমার প্রশংসা করে আমি আজ লিখব এ গাথা।

সেই চাঁদ দেখে ঘুমায় বাংলার গ্রাম
ঘুমে স্বপ্ন আছে–
নিমগ্ন আঙুল তুলে সারারাত অন্ধকারে আঁকো
সাহসী পুত্রের ঘোড়া, হাতীশাল, সোনালী গম্বুজ,
সুখ, ধবল প্রাসাদ।[২৮]

বাংলাদেশের সৃষ্টির সমস্ত আন্দোলন এই কবিকে আলোড়িত করেছে। তিনি জানেন এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন শুধু ঐতিহাসিক ঘটনামাত্র হয়ে থাকতে পারে না। বরং এদেশের মুক্তিকামী সকল মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে তা অনুপ্রেরণা যোগাবে। আমাদের জাতীয় সত্তাকে উদ্বেলিত করবে। তিনি কবিতার সূক্ষ্ম শরীরে এসব প্রসঙ্গকে তুলে আনেন অনুভববেদ্য এক উপাদান হিসেবে। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ তাঁর কবিতায় অনবদ্য একচিত্র হিসেবে স্থির হয়ে রয়েছে:

জ্যোৎস্নায় আক্রান্ত মরু, ভয়াবহ যোজন বালুতে
সে ঠিক সিংহের মতো বহুদূরে করে পায়চারি;
নিভৃত সংসার তাকে কিছুতেই পারবে না ছুঁতে
যেন তুচ্ছ তার কাছে পিতামাতা মফঃস্বল বাড়ি।
নতুন জামায় তাকে মানিয়েছে চমৎকার আজ।
মধ্যরাতে ফিরে এলো খোকা নয় শহীদের লাশ।[২৯]

বায়ান্নোয় বাষট্টিতে উনিশ শো উনসত্তরের একাত্তরে
অবিরাম কুঠারের ধ্বনি। ঠক ঠক ঠক ঠক
বাংলার দক্ষিণে বামে রাত্রি দিন ...
ঈশ্বরের রাজপথ রক্তে ভেসে যায়।
স্বর্গীয় ফলের মতো ফেটে যায় বাংলার আকাশ।
চারদিকে ঠক ঠক এ কোন কুঠার?[৩০]

স্বাধীনতার স্বরূপ তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর অজস্র কবিতার পংক্তিতে। এই উচ্চারণ বাংলার সামগ্রিক জীবন-প্রত্যয়ের ছবিকে ধারণ করে। স্বাধীনতার পরে পরবর্তী দশকে এদেশের কবিরা আমাদের স্বাধীনতার তাৎপর্যকে কবিতার শৈল্পিক প্রকাশে মূর্ত করেছেন। পঞ্চাশের দশকের অন্যতম কবি হিসেবে সৈয়দ শামসুল হকও আমাদের গর্ব ও অহংকার ও সার্বিক বোধকে ধরে রেখেছেন তাঁর কবিতায়। স্বদেশের বন্দনা নয়, বরং গভীর জীবনবোধ ও আত্যন্তিক সম্পর্ককে ধারণ করে তাঁর কবিতা। কবি হৃদয়ের সমস্ত আকুতি-আর বিশ্বাসকে স্বাধীনতার বীজমন্ত্রে লীন করতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজস্ব অভিনিবেশ স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবিদার।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, চেতনা, যুদ্ধ জাতীয়তা ইত্যাকার প্রসঙ্গ আমাদের কবিতার অন্যতম অনুষঙ্গ। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে আছে ঔপনিবেশিক শাসন, আর পাকিস্তানি শাসনের পর্যুদস্ত পটভূমির ওপর। স্বাভাবিকভাবে আমাদের শৈল্পিক-মানস গঠিত হয়েছে রাজনৈতিক চেতনার আলোকে। সেটা আমাদের অস্তিত্বগত চেতনাও বটে। বাংলাদেশের কবিতায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে অন্যতম উপাদান হিসেবে। বহুসংখ্যক কবি তা ব্যবহার করেছেন। তবে, উন্মত্ত চেতনাকে শিল্পের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের নিরিখে প্রকাশ করা সব সময় সহজ হয়ে ওঠে না। কারণ, রাজনৈতিক উত্তাপ কবিতার বাণী এমনকি শরীরকে ও দুর্বল করে দিতে পারে।

রাজনৈতিক কবিতা লেখার একটা ঝুঁকি থেকেই যায় সব সময়। কবির শারীরিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হওয়া ছাড়া ও কবিতার উৎকর্ষের দিকটা বিপন্ন হবার সম্ভাবনাও দেখা দেয়। যাঁরা রাজনৈতিক

> কবিতা লেখেন তাঁদের মধ্যে সরলীকরণের দিকে ঝুঁকে পড়া দুর্লক্ষ্য নয়, রাশি রাশি রাজনৈতিক পদ্য অধঃপতিত হয় শ্লোগানে। কখনো কখনো শ্লোগানও আমাদের কাছে মূল্যবান ঠেকে। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যাতে আমরা কখনো শ্লোগানকে কবিতা ব'লে ভুল না করি। ...অনেকের ধারণা রাজনীতিক ধারণ করলে কবিতা আর কবিতা থাকে না। এই ধারণার প্রতি আমার সায় নেই। রাজনীতি-নির্ভর কবিতা উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট দু'ধরনেরই হতে পারে।[১]

রাজনীতি আমাদের জীবনের সঙ্গে লীন একটি অনুষঙ্গ হলেও তাকে অন্বিত করে কবিতা রচনা করার ঝুঁকি থেকে যায়। কারণটা শিল্পের বৈশিষ্ট্যজনিত। শিল্প আমাদের জীবনের গভীর উপলব্ধিজাত সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়; সেখানে বাস্তবতার তীব্র আলো বা চিৎকারকে সরাসরি কবিতা বা শিল্পের শরীরে ব্যবহার করলে শিল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্যই নষ্ট হতে পারে। সাময়িকভাবে পাঠক উত্তেজিত হতে পারেন, তবে শিল্প তো সার্বজনীন আবেগকে ধরে রাখতে চায়। সৈয়দ শামসুল হক আমাদের স্বাধীনতা, সংগ্রাম, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, জাতীয় চেতনা, রাজনৈতিক ঐতিহ্য, জনপদ ও জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অজস্র কবিতা লিখেছেন।

বস্তুত স্বদেশকে নির্মাণ করতে, তিনি বহুমাত্রিক চেতনার সাথে যুক্ত করেছেন জাতীয় চেতনাকে। আমদের ইতিহাস, সংগ্রাম, জনগোষ্ঠী, প্রকৃতি সব অভিন্ন সত্তা হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক চেতনা ও সংগ্রামকে কবিতার বিষয় করে তুলতে তিনি নির্মাণ করেছেন নানামাত্রিক প্রকরণ। মূলত তীক্ষ্ণ কাব্যবোধ ও গভীর প্রত্যয় উঠে এসেছে এই সব পংক্তি। সেখানে কবিতা আমাদের বাহ্য চারিত্র্য নয়, বরং অন্তর্গত বিশ্বাস, চেতনা, সংকল্প, বোধ ও ধারাবাহিক সংগ্রামী মননের সূক্ষ্মবহিঃপ্রকাশ। তিনি স্থূল বাক্‌ভঙ্গিমা, বক্তৃতা-বিবৃতি কিংবা স্লোগান ব্যবহার করেননি কখনো। তাঁর এই সূক্ষ্ম শিল্পবোধ তাঁর কবিতাকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উন্নীত করেছে। আমাদের মর্মমূলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীপ চেতনাকে আরো বেশি উচ্চকিত করে তোলার জন্য তিনি স্মরণ করেছেন জাতীয় বীরদের। জননী, জন্মভূমি, জাতীয় বীর আর শ্যামল বাংলাকে, এমনকি তাঁর নিজের শহরকে তুলে এনেছেন গাথা জাতীয় কবিতায়। এই কবিতায় রয়েছে গ্রীক নাটকের কোরাসের মতো সম্মিলিত জনগণের কণ্ঠস্বর। জাতীয় চেতনাকে উজ্জীবিত করতে তাঁর এই পদ্ধতি সফল বলতে হবে। গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে নতুন এক কাব্যভঙ্গিও একে বলা চলে। এই জাতীয় কবিতার পংক্তিতে সৈয়দ শামসুল হক আমদের সামগ্রিক চেতনার পরিচয় তুলে ধরেছেন। কখনো আমাদের বিজয় গাঁথা, কখনো যুদ্ধ-বিগ্রহের দুর্মর স্মৃতি, কখনো খেদ, আবার কখনো দৃঢ় সংকল্প। বস্তুত, তিনি দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র কবিতায় গেঁথে তুলেছেন বাংলাদেশের হৃদয়, আকাঙ্ক্ষা, আকুতি ও ইতিহাস।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে জীবনযাত্রা, জীবন জিজ্ঞাসা, জাতীয়তাবোধ ও অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। স্বাধীনতার বীজমন্ত্র নিয়ে যে জাতি এগিয়ে যাবার কথা, কার্যত তা থেকে জাতি আজ বিচ্যুত। আমাদের স্বদেশ আজ বিপন্ন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, প্রশাসন এবং সর্বোপরি এই চিত্র ক্রমঅপস্রিয়মাণ একটি জাতির ভয়ংকর চিত্র। সৈয়দ শামসুল হক সমকালীন বাংলাদেশের এই ভয়াবহ অবস্থাকে কবিতার পংক্তিতে তুলে ধরেছেন।

নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত এই কবি বাংলা প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন, তবে নাগরিক বাক-চিত্রই বেশি ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়। স্বদেশ ভাবনার নতুন এক মাত্র যোজন করেছেন কবি ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে। দীর্ঘ সময় ধরে এই শহরে বাস করার ফলে তাঁর চেতনার সাথে জড়িয়ে গেছে এই শহর– এই শহরের বিভিন্ন স্থান, ইতিহাস, বন্ধু-বান্ধব। চার দশক এই শহরে বাস করার ফলে ঢাকা শহর নিয়ে তিনি অনেক দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। এই জাতীয় কবিতায় মূলত স্বদেশ ও স্বদেশের জনগণের প্রতিচ্ছাপ ধরা পড়ে। 'আমার শহর'

নামক দীর্ঘ কবিতাটি কবির এই জাতীয় কবিতায় শ্রেষ্ঠ উদাহারণ। নাগরিক বাস্তবত প্রতিদিনকার জীবনযাত্রা ও শহুরে জীবনের নানা বিড়ম্বনা-হাসি-কান্না আড্ডা-বন্ধু-বান্ধব-স প্রসঙ্গের সমন্বয়ে ধরা পড়েছে তাঁর নাগরিক মনন।

সৈয়দ শামসুল হক পঞ্চাশের দশকে অন্যতম শক্তিমান কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তা কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের কারণে। প্রথমত তিনি তাঁর কবিতার নিজস্ব জীবনদর্শন, আত্মজিজ্ঞা আবিষ্কার করেছেন। স্বকীয় জীবনচেতনাকে নিজস্ব ভাষাকৌশলের মাধ্যমে প্রকাশের স্বত ধারা তৈরি করেছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু নানাদিকে প্রসারিত। ব্যক্তি কবি আশৈশব অভিজ্ঞতা, স্বদেশ, প্রকৃতি, প্রেম-প্রণয়, ইতিহাস, সময়, মিথ, বৈশ্বিক আব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, নাগরিক-গ্রামীণ ও আঞ্চলিক জীবন প্রতীতি ও সর্বোপরি মানবের শাশ্ব অনুভববেদ্য-সংবেদনশীল অনুধ্যান সূক্ষ্মভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। তৃতীয়ত, তি শিল্পের নান্দনিক ও প্রকরণগত বিষয়ে সচেতন। কবিতা সৌন্দর্যময় অনুভূতির প্রকাশ। সে অনুভব থেকে তিনি বরাবর বিষয়বস্তুকে নতুন রীতিতে উপস্থাপন করেছেন। বাংলা কাব্যধার নানামাত্রিক বৈশিষ্ট্যসহ, ইউরোপীয় কাব্য ধারার বিভিন্ন পর্যায়ের রীতি-কৌশলকে তি ব্যবহার করেছেন নব আঙ্গিকে। এক্ষেত্রে প্রাচীন-মধ্যযুগের রীতিকে, কখনো গ্রিক কোরাস ব্যবহার করেছেন। ফরাসি কবিতার নিরীক্ষা তাঁকে প্রাণিত করেছে। বাংলা শব্দ,ধ্বনি, বাক্য কবিতার শরীরে অর্থের ব্যঞ্জনায় গেঁথে দেবার দুর্নিবার চেষ্টায় তাঁকে সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ব যায়। এ ব্যাপারে তিনি সফল। কখনো কখনো নিরীক্ষাই থেকে গেছে তাঁর চেষ্টা, কবিত প্রসাদগুণ অন্বিত হয়নি তাতে। তবে, শব্দ, অর্থ, ধ্বনিঝংকার ও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারে তি বাংলা কবিতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। চতুর্থত, বিশ্ব কবিতার পাঠজাত বীক্ষণ তাঁর কবিতা আধুনিক ও বৈশ্বিক করে তুলেছে। বাংলা কবিতায় এই গ্রহণ নতুন নয়। ত্রিশের কবিরাই এ শুরু করেছিলেন। সৈয়দ শামসুল হক ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের কবিতার প নেবার ফলে তাঁর ঋদ্ধ মননের প্রতিফলন ঘটেছে কবিতায়। পঞ্চমত, চিন্তা-মননে, অনুভ ঋদ্ধিতে ও রচনাশৈলীর নিরিখে তিনি মৌলিক। মেধা, মনন, প্রজ্ঞা ও শক্তি-সুষমায় তাঁর ক প্রতিভাকে অনন্য-স্বতন্ত্র করে তুলেছে।[২]

জীবন চেতনার গভীরতায়, প্রাতিস্বিক বোধজাত অনুভবে, নিজস্ব শিল্পরীতিতে, প্রক নিরীক্ষার সহায়তায়, তাঁর কবিতার নিজস্ব জগৎ তৈরি হয়েছে। শব্দ বিন্যাসে, ধ্বনিঝংকা গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জনায় তাঁর কবিতা মানবের শাশ্বত সংবেদকে প্রকাশ করেছে। তিনি দীর্ঘ সময় পটভূমিতে নিজের অস্তিত্ব-চেতনা ও অনুভবকে নবআঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন।[৩] ফলত, তি প্রতিভাবান, শক্তিমান কবির নিজের বোধ ও বিবর্তনের রূপকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

তথ্যসূত্র

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, অনু হোসেন সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রথম প্রকা মার্চ ২০১৬; বাংলা একাডেমি, ঢাকা। পৃ. ২৩৩

২. পরানের গহিন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক, সম্পাদনা শামসুজ্জামান খান, প্রথম প্রকাশ-অক্টে ২০১৬; বাংলা একাডেমি, ঢাকা। পৃ. ৭৫

৩. বাংলা একাডেমি লেখক অভিধান, প্রধান সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০৮; বাংলা একাডেমি, ঢাকা। পৃ. ৪৩৪

৪. কবিতা সংগ্রহ, সৈয়দ শামসুল হক, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা। পৃ. ১১৭

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
১১. তিন শিল্পী : শিল্পের অনুচেতনা, ইয়াসমীন আরা লেখা, প্রথম প্রকাশ-একুশে বইমেলা ২০১৪; সমাচার, ঢাকা। পৃ. ৫৩
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬২
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩
২৮. রাজনৈতিক কবিতা, সৈয়দ শামসুল হক, প্রথম প্রকাশ-১৯৯১; অনন্যা, ঢাকা। পৃ. ১৬
২৯. কবিতা সংগ্রহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
৩০. শামসুর রাহমানের রাজনৈতিক কবিতা, শামসুর রাহমান, ২য় মুদ্রণ-১৯৯৫; সুর্বণ, ঢাকা। পৃ. পূর্বলেখ
৩১. তিন শিল্পী : শিল্পের অনুচেতনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩